ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

রবীন্দ্র চিন্তায় শিশু মনস্তত্ত্বঃ প্রসঙ্গ ছোটগল্প

মোহাম্মদ সফিকুল আলম*

সারসংক্ষেপ: বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায়, প্রতিটি স্তরে তাঁর নিপুণ হাতের দক্ষ লেখনী প্রতিভাত হয়েছে আপন মহিমায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিশু মনস্তত্ব একটি উল্লেখযোগ্য দিক। মানবমনের বিচিত্র এ দিকটিও তাঁর লেখায় প্রতিভাত হয়েছে নিখুঁতভাবে, যা সুধীজনের প্রশংসা কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর লেখা নাটক, উপন্যাস ও কবিতায় এ দিকটি প্রকাশিত হলেও আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে দিকটি নিয়ে আলোকপাত করব।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকীতে রচিত মানপত্রে শরৎচন্দ্র এই বলে শুরু করেছিলেন– 'তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।' তার আরো আশি বছর পর অর্থাৎ এই সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে এসে যখন আমরা তাকাই সে বিস্ময়বোধের অনুরূপ মনে হয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ব্যক্তিস্বরূপে বিশিষ্টতা মনুষ্যত্বের সার্বভৌম অভিব্যাপ্তিতে এবং কবি-প্রতিভার সর্ববিধ বিভাগেই তাঁর স্বাক্ষর ও সাফল্য বিস্ময়াবহ। তিনি সাহিত্যপ্রগতির অত্যাধুনিক পথপ্রদর্শকদেরও শীর্ষস্থানীয়। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রবর্তীরা যে সার্বভৌম সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পান নি, সেই কল্পনাবিলাসকে দেশের দৃষ্টিগোচরে এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এক মহাবিস্ময়কর প্রতিভা। সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই, যে শাখায় তিনি লেখেন নি। প্রতিটি শাখাতেই তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও তিনি অতুলনীয়। তাঁর অবদানেই বাংলা সাহিত্য আজ পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে।[২] বাস্তবিকই, রবীন্দ্রনাথ বিচিত্ররূপের সমাবেশে নিজেকে দেখেছেন। শিশুসুলভ সারল্য আর তারুণ্যের উচ্ছলতা নিয়ে তাঁর অনন্য সৃষ্টিসমূহ আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। জরা আর বার্ধক্যকে পরিহার করে আজীবন তিনি তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন।[৩] সবরকম তুচ্ছতা, বিভেদ, সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজীবন ব্রতী ছিলেন অনির্বাণ প্রদীপ জ্বালানোর নিমগ্ন সাধনায়। শিল্প ও সাহিত্যকর্মের প্রতিটি শাখায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। বিশেষ করে ছোটগল্পে তাঁর কীর্তি ও খ্যাতি অবিস্মরণীয়। তাঁকে 'বাংলা ছোটগল্পের জনক' বললেও অত্যুক্তি হবে না।[৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে মানবজীবনের বিচিত্র রূপকে চিত্রিত করেছেন দক্ষ হাতে। তন্মধ্যে শিশু মনস্তত্ত্বের দিকটিও প্রতিভাত হয়েছে সার্থকভাবে। তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্পে তিনি শিশু চরিত্রগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে মনে হতে পারে, তিনি চরিত্রগুলোকে খুব কাছে থেকে অবলোকন করেছেন। শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা গভীরভাবে বুঝতে না

*শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী শাখা, রামপুরা, ঢাকা

পারলে তাঁর পক্ষে এমন লেখা সম্ভব হতো না। ছুটি, কাবুলিওয়ালা, বলাই, ইচ্ছাপূরণ ইত্যাদি গল্পগুলো এ অনুপম সত্যেরই জীবন্ত স্বাক্ষর। সাহিত্যিক মিলন রায়ের মতে,

> রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ছোটদের নিজস্ব মনোজগতের ছবি, তাদের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ছবি এইসব গল্পে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এগুলো ছোটদের মনোজগতের বিকাশে, চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনবে।...তাঁর ছোটদের জন্যে লেখা গল্পগুলো শুধু ছোটদের জন্যেই নয় বরং যে কোনো শ্রেণীর পাঠকের জন্যেই উপযোগী।[৫]

রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ* গ্রন্থের সবকটি গল্পই অসাধারণ। প্রায় সবগুলো গল্পই বিশ্বমানের। তবে যে গল্পটি পাঠকের হৃদয়ে গভীরভাবে নাড়া দেয় সেটি হলো 'ছুটি'। কিশোর বয়সের মানসিক অবস্থা নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার প্রমাণ এই 'ছুটি' গল্পটি। গল্পের শুরুতেই লেখক তের-চৌদ্দ বছরের শিশু-কিশোরদের অভিরুচি বা মনোজগৎ পাঠকদের নিকট তুলে ধরেছেন এইভাবে:

> বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে। যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।[৬]

শিশু-কিশোররা জেদি, স্পষ্টবাদী হয়ে থাকে। সত্য প্রকাশে তারা থাকে অনড়, আপোষহীন। তাই তো ফটিক মায়ের কাছে মাখনের মিথ্যা নালিশ মেনে নিতে পারেনি।[৭] ফটিক আচরণে দুরন্ত কিন্তু ছোট ভাই মাখন তুলনামূলকভাবে শান্তশিষ্ট ও পড়াশুনায় মনোযোগী। ফটিককে নিয়ে তার মা খুব চিন্তিত। ফটিকের মামা তাদের বাড়ি বেড়াতে এলে মা তাঁকে বিস্তারিত অবহিত করেন। মামা ফটিককে কলকাতায় তাঁর নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফটিকও সানন্দে মামার সাথে কলকাতায় যেতে সম্মত হয়। কারণ নতুন স্থানের প্রতি শিশু-কিশোরদের কৌতূহল স্বভাবজাত। ফটিক মনে করেছিল, মায়ের শাসন এড়িয়ে মামাবাড়িতে সে মনের আনন্দে বেড়াতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনায় শিশু মনস্তত্ত্বের এ দিকটিও বাদ যায়নি।

কিশোর বয়সে হঠাৎ শরীর মনে জৈবিক কারণেই একটা পরিবর্তন আসে, তখন চেহারায় কমনীয়তা এবং কণ্ঠস্বরের মাধুর্য থাকে না। শরীরেও বেশ একটা বেপরোয়া ভাব আসে যেটা স্বাভাবিক হলেও অনেকেরই অসহ্য মনে হয়। বড়দের দৃষ্টিতে তা বেমানান মনে হয়। শৈশবের কমনীয়তা ও কণ্ঠস্বরের মধুরতা হারিয়ে যাওয়ার ফলে বড়রা অনেক সময় তাদের সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> বিশেষত, তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথা ও ন্যাকামি, পাকা কথা ও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া ওঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে

> অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাফ করা যায়; কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।[৮]

আর তাই কলকাতায় গিয়ে ফটিককে নিরাশ হতে হয়। শহরের স্নেহবিমুখ ইট-কাঠের পরিবেশে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। তদুপরি মামি ও মামাত ভাইদের সীমাহীন অবহেলা ও অবজ্ঞা তাকে বেদনাহত করে তুলেছে। এ প্রতিকুল পরিবেশ থেকে সে চেয়েছে মুক্তি। অসুস্থ অবস্থায় মামির গলগ্রহ হবার ভয়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু পুলিশ তাকে মামা বাড়ি ফিরিয়ে আনে। জ্বরে আক্রান্ত হলে সময় মতো উপযুক্ত চিকিৎসার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবার কারণে মামার বাড়িতেই ফটিক মারা যায় এবং ইহজগৎ থেকে চিরমুক্তি লাভ করে। এরূপ ছোট্ট একটি কাহিনীর প্রেক্ষাপটে অল্প কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে লেখক বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক অবস্থাকে পাঠকের সামনে মূর্ত করে তুলেছেন এবং সন্দেহ নেই— এতে তিনি মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

'ইচ্ছাপূরণ' নির্মল হাস্যরসের গল্প।[৯] এ গল্পে কবিগুরু যে শুধু শিশু-মনোবৃত্তির পরিচয় তুলে ধরেছেন তা নয়, পাশাপাশি বড়দেরও ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা তুলে ধরেছেন। গল্পে পিতা-পুত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব তিনি প্রকাশ করেছেন এইভাবে:

> সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেইজন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না। ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাহার আর রক্ষা থাকিত না।[১০]

দুরন্ত বালক সুশীলের স্কুলে যেতে মন চায় না। ভূগোলের পরীক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে তার বড্ড ইচ্ছে করে পাড়ার বোসেদের বাড়িতে বাজি পোড়ানো উৎসব উপভোগ করতে। এজন্য সে অসুস্থতার ভান করে বিছানায় পড়ে থাকে। বাবা সুবলচন্দ্রের ইচ্ছা, আবার ছেলেবেলা ফিরে পেলে তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করবেন। ইচ্ছাঠাকরুন তাদের দুজনের ইচ্ছাই পূর্ণ করে দিলেন। কিন্তু এবার ফল হলো উল্টো। প্রতি পদে পদে বাবা সুবল হেনস্থা হতে থাকলেন। ওদিকে সুশীলের কর্মকাণ্ড মানুষের হাসির খোরাক হল। পরিণতিতে সবাই আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসল। নিষ্কলুষ হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মানবমনের অবাস্তব চিন্তা-চেতনাকে অসার প্রমাণ করে দিলেন।

'বলাই' গল্পটি বিশ্বমানবের সাথে বৃক্ষের আজন্ম সম্পর্কের দলিল। পাশাপাশি সবুজ গাছের সাথে অবুঝ কিশোরের আত্মার বন্ধনও এতে প্রতিভাত হয়েছে। রাস্তার পাশের অবহেলিত গাছ বলাইয়ের কাছে পরম বন্ধু। তাদের কষ্ট বলাইকে পীড়া দেয়। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কর্তৃক নিরীহ গাছকে ভালবাসার উদাহরণ এ জগৎ-সংসারে বিরল। এ বিচিত্র ঘটনাই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন 'বলাই' চরিত্রটির মধ্যদিয়ে। পরিবেশ-বন্ধু গাছকেই স্বল্পভাষী বলাই বেছে নিয়েছে নিঃসঙ্গ জীবনের একান্ত সাথি হিসেবে। বলাইয়ের মানসিক কষ্ট রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন এইভাবে:

> কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারো কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আম্‌লকি পাড়ে; ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দুপাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস করে বকুল গাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়— ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সবচেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে।[১১]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় বৃক্ষকে 'আদিপ্রাণ' বলেছেন।[১২] আর 'বলাই' গল্পে সেই আদিপ্রাণের সাথে মানব-অস্তিত্বের প্রাগৈতিহাসিক সম্পর্কের মুহূর্তটিকে তুলে ধরেছেন বলাইয়ের মনোজগৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে—

> এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে — সেদিন পশু নেই, জীবনের কলরব নেই, চারদিকে পাথর আর পাঁক আর জল।[১৩] কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক... ।[১৪]

বাড়ির উঠোনে বেড়ে ওঠা শিমুল গাছের অস্তিত্বহীনতা বলাই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তার পক্ষে যে কেউ নেই। তবুও শেষ চেষ্টা হিসেবে মাতৃহীন শিশুটি গেল কাকিমার কাছে। কাকিমার আগ্রহেই নির্বোধ গাছটার আয়ু কিছুদিন বেড়ে গেল। জীবনের প্রয়োজনে বলাই একসময় বিলেত চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়েও সে ভুলতে পারেনি তার প্রাণের দোসর শিমুল গাছটিকে। তাই তো সে কাকিমার কাছে শিমুল গাছটার একটি ছবি চেয়েছে। হয়তো গাছের ছবি দেখেই তার নিঃসঙ্গপ্রাণ শান্ত করতে চেয়েছে।

শিশুরা চিরকালই স্নেহ-মমতার কাঙাল। 'ইঁদুরের ভোজ' গল্পের[১৫] ছেলেরা কিছুতেই নতুন পণ্ডিতকে মেনে নিতে চায়নি। তারা দীর্ঘদিনের চেনাজানা পুরনো শিক্ষকের শাসন-সোহাগেই অভ্যস্ত। ভাগ্যক্রমে নতুন পণ্ডিত কালীকুমার তর্কালঙ্কার যে গাড়িতে করে বিদ্যালয়ে আসছিলেন, সেই একই গাড়িতে করে স্কুলে ফিরছিল তারা। পথে ছেলেরা নবাগত বৃদ্ধকে না জানিয়ে তার সব খাবার খেয়ে ফেলল। বৃদ্ধ সবকিছু বুঝতে পারলেন। বুঝেও তাদের প্রশ্রয় দিলেন। তাকে নিয়ে ছেলেদের রচিত ব্যাঙ্গাত্মক ছড়া শুনার পরেও তাদেরকে পরম মমতা দিয়ে কাছে টানলেন। এভাবে তাদের মন জয় করে অবশেষে স্কুলে বিজয়ীর বেশে পরম সমাদরে যোগদান করলেন নতুন পণ্ডিত কালীকুমার তর্কালঙ্কার। এই অল্পবয়সী বালকদের মন কীভাবে জয় করা যায় সেই কৌশল ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন পণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুরধার লেখনীর গুণে সহজ সরল একটি গদ্যই নির্মল ও সুখপাঠ্য রসরচনায় পরিণতি লাভ করেছে।

পাঁচ বছরের চঞ্চলা মেয়ে মিনিকে নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের অতি জনপ্রিয় গল্প 'কাবুলিওয়ালা'।[১৬] মিনি এক মুহূর্তও মৌনভাবে নষ্ট করে না। তার চঞ্চলতায় মা অতিষ্ঠ। বাবার প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠে সে। নানান রকম অবান্তর প্রশ্ন করে লেখক-বাবাকে বিব্রত করে

পরমানন্দ লাভ করে মিনি। যখন-তখন রাস্তার অপরিচিত মানুষকে ডাক দিয়ে ভেতর-বাড়িতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া স্বভাব তার। আর এভাবেই পরিচয় হয় ভিনদেশি কাবুলিওয়ালার সাথে। তার সাথে দুষ্টুমি করে, ভাব বিনিময় করে। একটা সময় কাবুলিওয়ালা তাকে নিজ মেয়ের জায়গায় কল্পনা করে। এভাবেই এগিয়ে চলে গল্পটি। 'তোতাকাহিনী' গল্পে[১৭] আমরা দেখি, রাজার সুবিধাভোগী তোষামোদকারীদের ষড়যন্ত্রে মূর্খ পাখিটাকে বিদ্যা শিক্ষা দেবার বিশাল আয়োজন চলতে থাকে। একসময় হতভাগ্য পাখিটা মারা যায়। পাখির স্বভাব হচ্ছে উন্মুক্ত বনে ঘুরে বেড়ানো। তাকে জোর করে বিদ্যা গেলানোর পরিণতি তার নির্মম মৃত্যু। সেই করুণ পরিণতি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ফুটে উঠেছে এইভাবে—

> পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'
> ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।'
> ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।'
> রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়।'
> ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'
> 'আর কি ওড়ে।'
> 'না।'
> 'আর কি গান গায়।'
> 'না।'
> 'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।'
> 'না।'
> রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি।'
> পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।
> বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।[১৮]

মূলত পাখি এবং শিশু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে ওঠার কথা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু এদের ওপর চাপিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে— এদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ গল্পটিতে দেখিয়েছেন যে, পুঁথিগত বিদ্যা শিশুর মনের বিকাশে সহায়ক নয়। শিশুকে তার মনের সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী বাড়তে দেওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পে[১৯] বর্ণিত হয়েছে রতন নামের পিতৃমাতৃহীন এক অনাথা বালিকার মর্মযাতনার করুণ ছবি। গল্পটিতে অত্যন্ত সাদাসিধে ভাষায় পোস্টমাস্টারের প্রতি রতনের নিখাদ ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। গ্রাম্য সরলা এই বালিকাটি পোস্টমাস্টারের অনুপস্থিতি মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ভালবাসার প্রতিদান স্বরূপ পোস্টমাস্টারের করুণার দানও সে গ্রহণ করেনি। স্নেহবুভুক্ষু এই ক্ষুদ্র অসহায় বালিকাটি শুধু একটুখানি মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা চেয়েছিল। লেখকের ভাষায়:

> কিছু পথখরচাবাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"— বলিয়া এক-দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।[২০]

রতন নামের মেয়েটি নিঃস্বার্থে সেবা করে গিয়েছিল পোস্টমাস্টারের। বিনিময়ে সে তাঁর কাছে কিছু চায়নি। আশ্রয়হীনা এই মেয়েটি হয়তো আশায় বুক বেঁধেছিল, পোস্টমাস্টার তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার সে আশায় গুড়ে বালি। পোস্টমাস্টারের বিদায়বেলার সেই করুণ দৃশ্যপট রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন এইভাবে:

> কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টঅফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।[২১]

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের জাদুকর। অসাধারণ মেধা আর দক্ষতায় সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন সদর্পে। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই তিনি আলোকপাত করেছেন তাঁর লেখনীতে। বাদ যায় নি শিশু মনস্তত্ত্বও। শিশুদের চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, কষ্ট-অনুভূতি তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন বলেই তিনি কবিগুরুর পাশাপাশি হয়ে উঠেছেন একজন শ্রেষ্ঠ শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ।

তথ্যসূচি:

---

১. 'মাসিক সচিত্র বাংলাদেশ' পত্রিকায় জামিরুল ইসলাম শরীফ তাঁর 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ: ধ্রুপদ খেয়ালে' শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনায় এ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পৃ. ২৪

২. *রবীন্দ্র-কিশোর গল্পসমগ্র* গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মিলন রায়ের ভাষ্য থেকে।

৩. কবির *বলাকা* কাব্যেগ্রন্থের 'সবুজের অভিযান' কবিতা থেকে –
চিরযুবা তুই যে চিরজীবি,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি। পৃ. ৩৩

৪. *রবীন্দ্র-কিশোর গল্পসমগ্র* গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মিলন রায় বলেন, "বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক ছোটগল্পের সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের হাতে। তাঁর আগে কিছু ছোটগল্প লেখা হলেও সেগুলোকে কোনোভাবেই সার্থক গল্প বলা চলে না।"

৫. প্রাগুক্ত

৬. *গল্পগুচ্ছ* গ্রন্থের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'ছুটি'; পৃ. ৬৪

৭. "তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল.'ফের মিথ্যে কথা!" প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৯. 'রবীন্দ্র-কিশোর গল্পসমগ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মিলন রায় বলেন,'অদ্ভুত রসের ছেলে ভুলানো গল্প রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ'। গল্পটি সাদাসিধে। শিশু কিশোরদের মন ভুলানোর জন্যেই লেখা।

১০. *গল্পগুচ্ছ* গ্রন্থের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'ইচ্ছাপূরণ'; পৃ. ১৬৩

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বনবাণী* কাব্যগ্রন্থের 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় উল্লেখ করেছেন:
"অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ,
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা"

১৩. প্রাগুক্ত; কবির এই বক্তব্যের সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় এইভাবে:
বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসব মন্ত্রহীন–
শাখায় রচিলে তব সঙ্গীতের আদিম আশ্রয়

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

১৫. 'ইঁদুরের ভোজ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের *চিরকালের সেরা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ১০৯

১৬. *গল্পগুচ্ছ* গ্রন্থের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'কাবুলিওয়ালা'; পৃ. ৬১

১৭. 'তোতাকাহিনী' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের *চিরকালের সেরা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ২৫১

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

১৯. 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'পোস্টমাস্টার'; পৃ. ৯

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২১. প্রাগুক্ত